www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

এই হেমন্তে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন বয়সে যত বার আমি কলকাতায় এসেছি, তত বারই বিভিন্ন কারণে এ শহর আমাকে দু'হাতে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে। মা যেমন করে। অবাধ্য ছেলের মতো তত বারই আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছি। কলকাতা আমার মা হবে কেন? আমি বিক্রমপুরের বাঙাল। মেড ইন ঢাকা। ময়মনসিংহ আমার কৈশোরের খেলাঘর। ব্রহ্মপুত্র নামের এক অলৌকিক নদীর ধারে ছিল আমাদের বাড়ি। উঠোন ঘিরে মাটির ভিটের ঘর সমূহ, ফলনশীল বাগান, মহান সব বৃক্ষের ছায়ায় শান্ত ও ছায়াচ্ছন্ন সেই বাড়ির পিছনেই পুকুর, একটু দূরেই মস্ত দিঘির মতো জমিদারদের পুষ্করিণী। পায়ে পায়ে জলাশয়, গাছপালা, খোলা বসতিহীন জমি। অবারিত পরিসর। আর, সেই চরাচরেরও কত মাত্রা ছিল। নিত্য আমাদের নবীন চোখে ধরা পড়ত আরও কত রূপকথার মতো মাত্রা। আকাশে উড়িছে বকপাঁতি বা নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনও ঝরিছে বৃষ্টিধারার জন্য রবি ঠাকুরের কবিতা খুঁজতে হত না। সোনালি ডানার চিল তখনও জীবনানন্দের কবিতায় গিয়ে সেঁধোয়নি। দোয়েল পাখিও ছিল, ছিল ভাঁটবন, মাদার গাছ, শিমূল ফুল। ছিল বাদল দিনের প্রথম কদমফুল, যা সত্যিকারের বলের অভাবে আমাদের পায়ে পায়ে বল হয়ে গড়াত।

কলকাতা মা হতে পারল না কখনও। কারও না। তবে, স্তন্যদায়িনীর মতো অন্যের ছেলেপুলে কাঁখেকোলে করে টেনেছে সে বিস্তর। আজও তার কাঁখে কোলে কাঁধে কাঁদি কাঁদি ছেলেপুলে ঝুলছে। সেই সব অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন স্তন্যপায়ীরা কেউ তাকে মায়ের সম্মান দেয়নি। তাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়েই সে বুড়ি হল। গঙ্গা তার সহেলি বটে, কিন্তু সে হল ভাগের মা, তাই গঙ্গা পেল না।

তবে, সব বৃদ্ধারই তো যৌবন ছিল এক দিন। আমার আশ্চর্য

শৈশবের কিছু দিন কেটেছিল মনোহরপুকুরের ভাড়াটে বাসায়। তখনও দুর্বাদলশ্যাম ট্র্যাকের ওপর দিয়ে বয়ে যেত ট্রাম। ইস্পাতের লাইন ঘন ঘাসের গভীরতায় ডুবে থাকত। হেমন্তে সত্যিকারের বিশুদ্ধ ধোঁয়াবিহীন কুয়াশা দেখা যেত ময়দানে। সকালে বিকালে জলকুলিরা রাস্তা স্নান করাত। বকুলের গাছ থেকে ঝরে পড়ত ফুল। মেট্রোর উল্টো দিকে, কার্জন পার্কে ছিল সবুজের গভীর দহ। সেই কলকাতা ছেড়ে যাই শৈশবেই। তেমন কষ্ট হয়নি, মনোবেদনা টের পাইনি একটুও। সৎ মা-কে ছেড়ে যেতে কি কষ্ট হয়? অথচ, '৪৭-এর ডিসেম্বরে ময়মনসিংহ ছেড়ে আসতে বুক বড় টনটন করেছিল।

তিন বছর কাটিয়ে যখন বাবার রেলের বদলিবহুল চাকরির সুবাদে এক দিন কাটিহারের সাহেবপাড়া ছেড়ে যেতে হয়েছিল, সে দিনও কী আনচান মনের মধ্যে! মনে হয়েছিল, কত কী ফেলে যাচ্ছি। কবেকার হারানো মার্বেল, লাটিম, বন্ধু, পেয়ারাগাছ, ল্যাংড়া বাগান, এমনকী চেনা ভিখিরিগুলোর জন্যও বিরহ বোধ করে চোখের জল ফেলেছি।

অথচ, কলকাতা কোল পেতে বসে থেকেছে আমার জন্য। সে জানে তার জন্য কার ও নাড়ি-ছেঁড়া টান নেই। তার জন্য চোখের জল জমা নেই কারও। সাহেব আমলে কলকাতার গায়ে যা একটু আধটু গয়নাগাটি ছিল, তার অপোগণ্ড, অকৃতজ্ঞ, পেলে-পুষে বড় করা বেইমান সন্তানেরা তাও কেড়ে নিয়ে গিয়ে রিক্ত করেছে তাকে। আজও করছে।

এই কলকাতার পশ নার্সিং হোম-এ বা ঝুপড়িতে, ফুটপাথে যেসব শিশু জন্মায়, আদরে-আহ্লাদে, দুধে-ভাতে বা ধুলোকাদায় ভিক্ষান্ন খুঁটে, অনেকে বলে, তাদের শৈশব বলে কিছু থাকে না। কলকাতার শিশুদের কি তবে শৈশব নেই? আমার তা মনে হয় না। শিশু তার শৈশব আপনি রচনা করে নেয়। চাপড়া-খসা ভাঙা দেওয়ালটার মধ্যে সে তার কল্পনার কত ছবিই না এঁকে নিতে পারে। বিলাসবহুল বাড়ি বা ফ্ল্যাটে যে শিশু বৈভবের মধ্যে বড় হয় বা যারা পথে-ঘাটে পেটে খোঁদল নিয়ে বসে থাকে, তারা ওই কল্পনার জগতে একাকার। শৈশবে সবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। গ্রহণ-বর্জন আসে বুদ্ধি পাকলে।

আমার শৈশব খানিকটা আমি ঊর্ণনাভের মতো নিজেই রচনা করিনি কি? আমার নানা কল্পনা, ভয়, অনুভব, সাধ আমার চারদিকে বুনে যেত লূতাতন্তুজাল। বোধের প্রথম উন্মেষ যখন ঘটল, সেই উষাকালের আলো-আঁধারিতে তার শুরু। মা, ঠাকুমা, জেঠিমা, পিসিমা, মাসিমা, দিদিমাদের নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপের ভিতর স্নেহ, প্রশ্রয়, আদিখ্যেতার জারক রসে একটু একটু দুষ্টু হয়ে উঠছি তখন, একটু একটু দামাল। চোখে অপার রূপমুগ্ধতা, বিস্ময়, ভয়। সেই তখন থেকেই আমার মতো করে শৈশব রচনা আমার।

এ আমার শৈশবের সাতকাহন নয়, এ হল অনুভূতিগ্রাহ্য এই চারপাশটাকে বারবার আবিষ্কার করা। যা প্রত্যক্ষ, স্পর্শযোগ্য, যা ফলিত, যা অনুভূতিযোগ্য, তা ছাড়া এই পারিপার্শ্বিকে আর কিছুই কি নেই? ইন্দ্রিয়াতীত কিছু? ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ও

পারে শম্ভুগঞ্জের জলাভূমিতে যে নীলচে শিখা লাফিয়ে উঠত মাঝে মাঝে, তা ছিল ভূতের লণ্ঠন। আলেয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তখন জানা নেই। জানা নেই বলেই গা ছ মছম করা যে আনন্দটা ভয়ের সঙ্গে মিশে থাকত সঙ্গোপনে, তা আমার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মতো। যখন বহুরূপী আসত বা মুশকিল-আসান, তখন তো জানাই ছিল মানুষই ওরকম বিকট সাজ সেজে আসে। তবু, ঠাকুমা বা জেঠিমার কোলে উঠে আঁকড়ে ধরে থাকতাম ভয়ে। কিন্তু, তার মধ্যে যে আনন্দের শিহরনও মিশে থাকত, তা আজ বেশ বুঝতে পারি। কখনও কখনও মৃদু ভয় বড়ই উপভোগ্য, অতি ভয় মারক।

কলকাতার কঠিন আস্তরণের ওপর ঋতুচক্র তার কেরামতি দেখাতে পারে না। বুড়ো বাজিকরের মতো সে ধুঁকতে ধুঁকতে আসে বটে, কিন্তু পরনের ছেঁড়া পাতলুন, নোংরা জামা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে যেতে হয় তাকে। এ শহর তার জায়গা নয়। যোধপুর পার্ক বাজারের কাছে রাস্তা-ঝোঁকা একটা মস্ত শিউলি গাছে শরৎকালে অজস্র ফুল ফোটে বটে, কিন্তু সেই গাছটার তলায় ডাঁই হয়ে জমে থাকা আবর্জনা, ময়লা জল। গাছ ফুল ফোটায়, ফুল ঝরায়, কেউ ফিরেও তাকায় না। শুধু আমি লোভীর মতো চেয়ে থেকে ভাবি, এক আঁজলা যদি পাওয়া যেত! জলে, কাদায়, আবর্জনায় অপমানিত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা শিউলি যে পৃথিবীর সেরা দশটা ফুলের একটা, তা বিশ্বাস হতে চায় না।

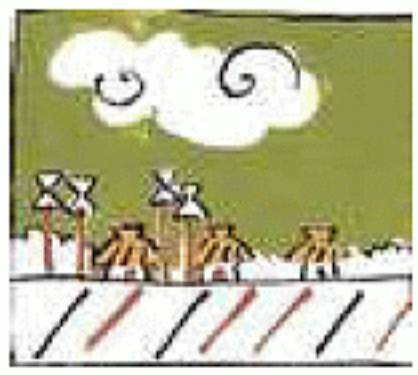

এই হেমন্তেই ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিনান্তে উঠে আসত শ্বেতকায় বিশুদ্ধ এক নিরেট কুয়াশা। পূর্ণ চাঁদকেও দেখাত ছোট্ট ডুমের মতো। কুয়াশা হেঁটে যেত আমাদের উঠোন দিয়ে। কুয়াশা ঝুলে থাকত করমচার গাছে, লেবুবনে, নার কোল গাছের ডগায়, পুকুরের জলে। আমাদের বারবাড়ির মাঠে লম্বা বাঁশের ডগায় আকাশপিদিম আলোকিত করত দেবযানকে। আর, ওই সন্ধের পর মা বা ঠাকুমা বা জেঠিমার বুক ঘেঁষে চুপটি করে থাকতে হত। ভয়, শিহরন, সূক্ষ্ম আনন্দ।

কলকাতায় মেট্রোর উল্টো দিকের অতীতের ফুটপাথে কিছু রুগ্ন গাছের সারি ধুলোটে, মলিন, হাড় জিরজিরে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কেউ তাদের লক্ষও করত না ভাল করে। এই শিরশিরে হেমন্তের সন্ধ্যায় হঠাৎ তীব্র মাদক এক গন্ধে চার দিকে তরঙ্গ তুলে তারা জানান দিত তারা সেই বিশ্রুত ছাতিম। ঋতুর বাজিকর ওই এক-আধটা আলটপকা খেলা এখনও দেখায় বটে, কিন্তু তার দিন গেছে। শরৎ, হেমন্ত চোরের মতো এসে মুখ লুকিয়ে চলে যায়।

কলকাতার কথা পরে। পাঁচ বা ছয় বছর বয়স তখন। বাবা রেলে চাকরি পেয়ে কাটিহারে গেলেন। মনোহরপুকুরের ভাড়ার বাড়ি ছেড়ে তাঁর পিছু পিছু আমরা। দিদি, আমি, মা। সাহেবি কেতার বাংলো বাড়ি দেখে আমরা হাঁ। টিনের চালের আর মাটির ভিটের ঘরে জন্মে বড় হয়েছি। কলকাতা কয়েক দিন পাকা বাড়িতে বাস দিল বটে, কিন্তু সে হল পায়রার খোপ। আর, এ যে আমাদের গেঁয়ো চোখে প্রাসাদ! চার দিকে বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা বাগান। সামনে দু'ধারে দেবদারুর সারি ওলা পাথরকুচির পথ। না, কাটিহারের সঙ্গে ময়মনসিংহের কোনও মিল নেই। ব্রহ্ম পুত্র নেই, পুকুর নেই, ঢেঁকিশাকের জঙ্গল নেই, শীতে নদীর বুকে জেগে ওঠা চর নেই। তবু, কাটিহারেরও কিছু ছিল। অন্য রকমের সব গাছ, পাখি, তাতে অন্য রক ম গন্ধ, অন্য রকমের পোশাক, কেতা। সাহেবসুবোয় ভরা ব্রিটিশ আমলের সেই

কাটিহারে গিয়ে আমরা কিছুটা থতমত, অপ্রতিভ।

আমার জীবনের প্রথম ভূতের সঙ্গে এখানেই মোলাকাত। কিন্তু, সেই মেমসাহেবের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়নি কখনো। এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু জুতো শুনেছি। দিনের পর দিন নিশুত রাতে আমার এবং শুধু আমারই ঘুম ভাঙিয়ে সে এসে চলে গেছে। কোন বার্তা সে বহন করে আনত আমার জন্য কে জানে! আজও জানা হয়নি। তবে, আমি জানি, পারিপার্শ্বিকের যেটুকু দেখা যায়, অনুভব করা যায়, দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য, জড় ও যাবতীয় যা আছে, তা-ই সব নয়। অন্য মাত্রায়, অন্য তরঙ্গে হয়তো বা অজানা কত কী রয়ে গেছে। হায়, আমাদের মস্তিষ্কের বড়াই। মানুষের যেটুকু মস্তিষ্ক দেওয়া আছে, তার অতিরিক্ত মেধা তার নেই। বিশ্বরহস্যের কাছে তার বিজ্ঞান দর্শন এখনও নতজানু।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হেমন্তের এক বিকেলে আচমকা হাজারটা যুদ্ধবিমানের শব্দে আমরা দৌড়ে বেরিয়েছি ঘর থেকে। মা ছুটে এসে নড়া ধরে আমাদের ভাইবোনকে টেনে নিয়ে গেল ঘরে। দরজা-জানালা আঁট করে বন্ধ। পাগলা এক টর্নাডো ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে যখন ধেয়ে এল, তখন সেই মজবুত একতলা বাড়িও থরথর করে কাঁপছে। বাইরে গাছগাছালি ভেঙে পড়ছে প্যাঁকাটির মতো। বাড়ি সেই ঝড়ের ধাক্কায় পড়ে যাবে ভয়ে মা আর আমাদের কাজের লোকেরা হাট করে খুলে দিল জানালা-দরজা। আমরা দুই ভাইবোন একটা টেবিলের তলায় জড়োসড়ো হয়ে অপার বিস্ময়ে দেখলাম, কী এক উন্মত্ত ঝড় আমাদের ঘরে ঢুকে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।

চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ছে। পড়ে ভাঙছে কাচের বাসন। ভয়ঙ্কর দুলছে সিলিং ফ্যান। ঘরের ভিতর দিয়ে মেল ট্রেনের মতো বয়ে যাচ্ছে ঝড়, কুটোকাটা, পাখির বাসা, গাছের পাতা, টিনের কৌটো, আরও কত কী। চওড়া জাফরি ঘেরা বারান্দা পার হয়ে তেরছা বৃষ্টির বল্লম বিশাল ঘরের এ প্রান্ত ও প্রান্ত চলে যাচ্ছে অনায়াসে। আজ অবধি ও রকম ভুতুড়ে ঝড় আর দেখিনি।

ঝড় থামতেই ছুটে গিয়ে দেখি, পিছনের বিশাল আমগাছ ভেঙে শয়ে শয়ে বক মরে পড়ে আছে। ভেঙেছে বাসা, ডিম। মরেছে যত কুসি কুসি ছানা। শান্ত, সুন্দর প্রকৃতির ভিতরেই লুকিয়ে থাকে মহম্মদি বেগ। কখন রূপ পাল্টে ফেলে কে জানে। থরহরি শরীরে এই সব বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চার ঘটছে তখন। সাত ঘাটের জল খেয়ে বড় হতে হয়েছে আমাকে। পাহাড়ে, জঙ্গলে, টিলার মাথায় ভূত-ভুতুড়ে সব জায়গায়। বাবার অবিরাম বদলি আর আমাদের অবিরাম ঠাঁইনাড়া। পাল্টে যাচ্ছে পরিবেশ, মানুষজন, প্রকৃতির পটভূমি, ভাষা। পাল্টে যাচ্ছে অনুভূতি, বোধ, বুদ্ধি।

কাটিহার ছাড়লেও মেমসাহেব ছাড়ল না আমায়। বাবা এক সাহেবের কাছ থেকে সোফা-সেট আর চারটে চেয়ার সমেত একখানা মস্ত বার্মা সেগুনের ডাইনিং টেবিল কিনেছিলেন। নিশুত রাতের মেমসাহেব তার হাই হিলের শব্দ তুলে এসে মাঝে মাঝেই পরিক্রমা করে যেত টেবিলটা। আর শুধু আমিই তা টের পেতাম। শুধুমাত্র আমিই। কেন, এ প্রশ্নের জবাব আজও মেমসাহেব নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছে।

মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই এক দিন আমার সমগ্র সত্তা মুচড়ে ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন উঠে এসেছিল, এলেম আমি কোথা থেকে? মাঝে মাঝে হঠাৎ তৃণভূমির লুকনো সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াত ওই প্রশ্ন। তার বিষে আমি যত বার জর্জরিত হয়েছি, তার সীমা নেই, সংখ্যা নেই। আজও ঘাতকের মতো সেই প্রশ্ন অলক্ষ্যে অপেক্ষা করে থাকে।

এই জীবন, এই স্পষ্ট সমগ্র জগৎ, এ কি একটা ঠাট্টা মাত্র? এ সবের মানে কী? কোন উদ্দেশ্যে রচিত এই জড় জগৎ, এই চৈতন্য, এই প্রাণ? জবাব নেই। হেমন্তের কুয়াশার মতোই যেন সৃষ্টির সমস্ত সত্য। কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। স্থির, নিরুত্তর। কলকাতা অপেক্ষা করেছিল বহু কাল। আমার জন্য। সে মা নয়, ধাত্রী মাত্র। তার প্রতি আমাদের কোনও কৃতজ্ঞতা নেই, ঋণ নেই। সাত ঘাটের জল খেয়ে কলকাতায় নোঙর ফেলে বসে আছি কত কাল। আর কোনও বন্দর ডাকেনি আমায়। তাই কোথাও যাওয়ার নেই। এই হেমন্তে কলকাতার পিঁজরাপোলে আঁতিপাঁতি করে খুঁজি আমার প্রিয় ঋতুগুলিকে। ময়মনসিংহে, কাটিহারে, মালজংশনে, দোমোহানিতে, লামডিঙে, বদরপুরে, পাণ্ডুতে, আমিনগাঁওতে তাদের সঙ্গে ছিল আমার খেলা। কোথায় তারা? খুঁজি আর খুঁজি। ভাঙা রাস্তা, উপচে পড়া আবর্জনা, বৃক্ষহীন ফুটপাথ, জনাকীর্ণ ময়দান, তৃণহীন পার্ক, পিঙ্গল আকাশ। কোথায় তুই? অতি ভয়ে ভয়ে, অনেক কষ্টে আনাচে-কানাচে তাদের মৃদু পদসঙ্কেত শোনা যায়। তার পর ত্রস্ত হরিণের মতো পালায়।

বুড়ি কলকাতা এখন ইন্দির ঠাকরুণের মতোই বড় তটস্থ, বড় বে-আব্রু, অশন বসনের বেসামাল অবস্থা, স্মৃতিবিভ্রম। নির্লজ্জ মানুষ কখনও কখনও হয়তো বুড়ির ঠোঁটে একটু লিপস্টিক ঘষে দেওয়ার চেষ্টা করে, গালে লাগিয়ে দেয় পাউডার, চোখে মাখিয়ে দেয় কাজল, তাতে আরও বিকট দেখায় তাকে, বে-আক্কেলে মানুষেরা কি টের পায় কলকাতা আজ আঁতে মরে, ভাতে মরে? দোহন শেষ হয়নি তার আজও, তার দুগ্ধহীন স্তনের ভাগীদার, দাবিদাররা আজও এসে হামলে পড়ছে তার বুকে, প্রকৃতিলক্ষ্মী পিছোতে পিছোতে চৌকাঠের বার, ঋতুচক্র উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফিরে যায়, কলকাতার গভীর গভীরতর অসুখ এখন।

লোক না পোক— কে বলেছিলেন না কথাটা? একশো কোটি ছাড়িয়ে মানুষ এখন পোকামাকড়দের, জীবজন্তুদের, গাছপালার জায়গা কেড়ে নিচ্ছে লুঠেরার মতো। অবাক কাণ্ড যে, দেশের সবচেয়ে বড় বিপদ যে জনগণের বাড়বাড়ন্ত সেটা বুদ্ধিমান কূটনীতিকরা বুঝতেই পারলেন না মোটে। কয়েকটা হোর্ডিং,

কিছু বিজ্ঞাপন, সামান্য কিছু অলস উদ্যোগের ফাঁক ফোকর দিয়ে মনুর সন্তানেরা চোরাপথে স্রোতের মতো এসে দেশ ভাসিয়ে দিল। আঁটবাঁধ দিলই না কেউ। আর তারাই অস্তিত্বের প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গে, অসমে, দক্ষিণবঙ্গে, বিহারে, তথা সারা দেশ জুড়ে ধ্বস্ত করে দিল প্রকৃতিকে, উবে গেল দণ্ডকবন, দাঁতনকাঠির টান পড়ে যায় সুন্দরবনে। কর্ণপ্রয়াগে এক বার বৃষ্টি আর দুর্যোগ দেখে ফেরার পথের দুরবস্থার কথা ভেবে টেনশন করছি, এক পাহাড়ি ভদ্রলোক আমাকে বললেন, সাহেব, ফেরার কথা ভেবে টেনশন করছেন? আপনি জানেন না, এই বৃষ্টি আমাদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ। চেয়ে দেখুন পাহাড়ের ঢালের দিকে, গাছ কেটে কেমন ন্যাড়া

করে দিয়েছে পাহাড়কে, গত দু'বছর বৃষ্টিই নেই। পাহাড় জ্বলে যাচ্ছে।

হ্যারিকেনের মায়াবী আলোয় শুরু হয়েছিল শৈশব। বাড়িতে রেডিয়ো এল যখন আমার চোদ্দো বছর বয়স। গ্যাসের উনুন উনিশ শো চুয়াত্তরে। এক জীবনের মধ্যে আমার কয়েক বার জন্মান্তর ঘটে গেল। টেলিভিশন, মাইক্রো-ওয়েভ, কম্পিউটারের ঘেরাটোপের মধ্যে বসেও কেন যেন ভ্রমবশে চমকে উঠি, জীবনের কন্ডাকটর কেউ কি কেবলই চেঁচিয়ে বলছে, পিছনের দিকে বড্ড এগিয়ে গেছেন স্যার!

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com